নাম: আমির হোসেন

জন্ম তারিখ: ৭ মে, ১৯৯২

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : প্রাইভেট কার চালক
শাহাদাতের স্থান : উত্তরা, এয়ারপোর্ট সংলগ্ন, ঢাকা

শহীদের জীবনী

একজন গাড়ি চালক
যার স্টিয়ারিংয়ের পাশে আজ
ইতিহাসের পতাকা উড়ছে

৭ মে ১৯৯২, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার বরগাঁও গ্রামে একটি নিঃশব্দ জন্ম হয়েছিল, যেটা একদিন হয়ে উঠবে বিদ্রোহের রক্তমাখা সনদ।নাম আমির হোসেন।পেশায় গাড়িচালক, এক প্রাইভেট কোম্পানির স্টাফ কার চালাতেন, কিন্তু জীবনটা চালাতেন অনেক বেশি সততা, অনেক বেশি নীরব সংগ্রাম দিয়ে।প্রতিদিন শহরের ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার মধ্যে কেউ ভাবত না এই মানুষটিও একদিন এই রাষ্ট্রের অন্যায় ট্রাফিক সিগন্যাল ভেঙে বেরিয়ে আসবে, তার নিজের খরচে, নিজের রক্তে।
পিতা খোরশেদ আলম, পেশায় কৃষক।মাটি চষে জীবন তুলে আনতেন প্রতিদিন, আর মা রহিমা বেগম, সেই জীবনের রান্না করতেন তপ্ত চুলায়, মুখে ঝাপসা হাসি আর চোখে লুকানো ক্লান্তি নিয়ে।স্ত্রী ইয়াসমিন বেগম ছিলেন সেই কুড়েঘরের রাণী, যার সিংহাসন ছিল রান্নাঘরের মাটির খুন্তি, আর যার স্বামী ছিলেন জীবনযুদ্ধের রাজপথের সৈনিক।বড় ছেলে ইয়াসিন, বয়স মাত্র পাঁচ, চোখে অনন্ত বিস্ময়।ছোট ইব্রাহিম যার বয়স আড়াই, এখনো জানে না কীভাবে বাবা বলে ডাকতে হয়, কিন্তু জানে বাবার ছবি ছুঁয়ে কাঁদতে হয়।তাদের পরিবার আজ দয়ার দানায় চলে, যেখানে স্বপ্ন শব্দটি নিষিদ্ধ, আর স্কুল ড্রেস একটি বিলাসিতা যেটা এখন আলমারির সবচেয়ে উপরের তাকেই পড়ে থাকে, ধুলোয় ঢাকা।আমির কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না।ভোট দেওয়ার দিন ছাড়া তিনি কোনোদিন কোনো মিছিলে যাননি।তাঁর একমাত্র দল ছিল পরিবার, তাঁর একমাত্র বৈঠক ছিল সন্ধ্যার পর ঘরের বারান্দায় স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে বসা।অথচ, ২০২৪ সালের আগস্টে, রাজধানী ঢাকার রাস্তায় যখন ফ্যাসিবাদী সরকারের গুলির গর্জন উঠছিল, তখন স্টিয়ারিং থেকে হাত সরিয়ে আমির গাড়ি থামালেন, নেমে দাঁড়ালেন সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।তিনি নাম লেখাননি কোনো দলে, কোনো ব্যানারে নয় শুধু বিবেকের ব্যানারে দাঁড়িয়েছিলেন।আর সেই দাঁড়ানোই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়ে উঠল।রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হয়ে যখন তিনি পড়েন, তখন তাঁর চোখে একটিই প্রশ্ন ছিল: "আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, তাও কেন?" প্রশ্নটি আজও বাতাসে ভাসছে, কিন্তু উত্তর দেয়নি কেউ রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন সবার মুখে নীরবতার মুখোশ।
শহীদ আমির হোসেন ছিলেন না কোনো পোস্টারে ঝুলানো নেতা, ছিলেন না কোনো ভিডিও বার্তার জনসভা-প্রিয় বক্তা।তিনি ছিলেন সেই লক্ষ সাধারণ মানুষের একজন, যারা প্রতিদিন গাড়ি চালায়, ভাড়া মেটায়, বিদ্যুৎ বিল জমা দেয়, সংসার টানে তবুও যাদের কণ্ঠে জমে থাকা প্রতিবাদ একদিন বিস্ফোরণ হয়ে ওঠে। আজ তাঁর পরিবার কুড়েঘরে বেঁচে আছে, না-জানা এক অভিমান নিয়ে।তাঁর শিশুরা আজো জানে না, কীভাবে তাদের বাবা এই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের জানা দরকার কারণ আমিরের মৃত্যু একটি ঘোষণাপত্র: এই দেশের ভবিষ্যত শুধু পলিটিক্যাল হ্যান্ডশেকে লেখা হবে না, তা লেখা হবে সেই হাতে যা একদিন স্টিয়ারিং ছেড়ে স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়েছিল।
আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
২০২৪ সালের জুলাই থেকে আগস্ট বাংলাদেশ যেন এক নতুন মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেছিল।এই যুদ্ধে শত্রুকোনো বিদেশি সেনাবাহিনী ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাক্ষুসে শাসনব্যবস্থা একটি সরকার, যা দশকের পর দশক ধরে গণতন্ত্রের মুখোশে একনায়কতন্ত্রের থাবা বসিয়ে রেখেছিল।শেখ হাসিনা নামের এক নারীর অধীনে তিনটি একতরফা নির্বাচন, একটিও যাতে জনগণের অংশগ্রহণ বা সম্মতি ছিল না তা চূড়ান্ত দুঃশাসনের মহাকাব্য হয়ে উঠেছিল। মানুষ তখন আর চুপ ছিল না।বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকে দিনমজুরের হাতঘড়ি পর্যন্ত সময় বলতে শুরু করে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রামে, চায়ের দোকান থেকে মসজিদের মিনারে: "এবার বৈষম্যের অবসান চাই।"
তখনই ৫ আগস্ট আসে—যেন কোনো মহাকালের নির্ধারিত তারিখ।ঢাকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে গুঞ্জন: "স্বৈরাচার পালিয়েছে।" কেউ বলে বিদেশে, কেউ বলে গোপনে সেনানিবাসে আত্মগোপনে।কিন্তু মানুষের মুখে তখন একটাই সুর বিজয়ের।রাজপথে নামে সাধারণ জনতা, রাজনৈতিক ব্যানারহীন, কেবল বুকভরা ক্ষোভ আর মাথাভরা স্বপ্ন নিয়ে।সেই উত্তাল ঢেউয়ের ভেতরে ছিলেন আমির হোসেন—একজন গাড়িচালক, এক সাধারণ পিতা, যার জীবনে কোনোদিন রাজনীতির আগুন ছুঁয়েও যায়নি।অথচ সেদিন তাঁর ভেতরের ন্যায়বোধ তাঁকে রাজপথে নিয়ে আসে, যেখানে কোনো বাহিনী তাঁকে ঠেলে দেয়নি—তাঁর বিবেকই তাঁকে দাঁড় করায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে।
বিমানবন্দর এলাকাটি তখন জনসমুদ্র।ঢাকার উত্তরে জড়ো হওয়া মানুষ তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কেবল একটি দাবি তুলছে "গণতন্ত্র চাই, ইনসাফ চাই।" তখনই আকাশ ফেটে নামে রাষ্ট্রের আসল চেহারা।আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, যারা মানুষ রক্ষার শপথ নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, তারাই অন্ধভাবে গুলি চালাতে থাকে।কোনো হুঁশিয়ারি নয়, কোনো ব্যাখ্যা নয় শুধু গর্জে ওঠা বন্দুক আর উড়ে আসা গুলির ঝাঁক।সেই মুহূর্তে, যখন সবাই দৌড়াতে ব্যস্ত, তখন আমির ছিলেন স্থির।তাঁর হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, মুখে কোনো স্লোগানও নয় শুধু এক গভীর দৃষ্টি, যেন বলছে: "আমার সন্তানদের আমি কেমন দেশ দিয়ে যাব?" তাঁর গলায় তখনই লাগে দুটি সরাসরি গুলি একটি গলার পাশে, আরেকটি একটু নিচে।একই সঙ্গে বুকে-পিঠে ছড়িয়ে পড়ে ছররা।রক্ত মাটিতে ঝরে পড়ে, সেই

রক্তে ভেসে যায় অনেক স্বপ্ন ছোট ছেলের স্কুল ব্যাগ, স্ত্রীর জন্য কেনা নতুন শাড়ির টাকা, মায়ের অসুস্থতার ওষুধের ফর্দ।

তিনি সেদিন রাস্তাতেই মারা যান, কোনো হাসপাতালে পৌঁছানোর সুযোগ পর্যন্ত পাননি।কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে ছিল না কোনোরকম আতঙ্ক ছিল এক অসম্ভব শান্তি, যা আসে শুধু তখনই যখন কেউ সত্যের পাশে দাঁড়িয়ে মরতে প্রস্তুত থাকে।আমির হোসেনের মৃত্যু কেবল একটি গুলির পরিণাম নয়, এটি রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন সাধারণ মানুষের নীরব অভ্যুত্থান।তিনি পতাকা হাতে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর লাশই হয়ে উঠেছিল নতুন পতাকা যেটি রক্ত দিয়ে লেখা, নিঃশব্দে উড়ছিল কোটি বঞ্চিত মানুষের হৃদয়ের মাটিতে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা ও মৃত্যু পরবর্তী নীরবতা

যুদ্ধশেষে নীরবতা নামে প্রথমে কানে বাজে গুলির গর্জন, তারপর নিস্তব্ধতা এত গাঢ় হয় যে, মানুষ ভুলে যায় সে বেঁচে আছে কিনা।তেমনই এক গা ছমছমে নীরবতায় ঢাকার বিমানবন্দর সড়কে পড়ে থাকে এক লাশ না, লাশ নয়, ইতিহাসের এক অদৃশ্য খসড়া: আমির হোসেন।গলার নিচে দুটি গুলির ঘা, বুকজুড়ে ছড়ার ফেড়ে যাওয়া চামড়া, রক্তে ভেজা জামা এই নিথর দেহ তখনো বলে যাচ্ছিল, "আমি মরে যাচ্ছি না, আমি রক্ত দিয়ে জেগে থাকব।' লোকজন ছত্রভঙ্গ, কেউ ছবি তোলে, কেউ পালায়।আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখে শুধু এক 'সংঘর্ষে আহত', রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এক 'অজানা লাশ'।হাসপাতালে নেওয়ার পথে সেই অ্যাম্বুলেন্সে, যার দরজা খোলা ছিল, বাতাস ভারী ছিল বারুদের গন্ধে সেখানে থেমে যায় আমিরের দেহের সমস্ত স্পন্দন।তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন নিঃশব্দে যেমনটি ছিলেন জীবনভর: উচ্চস্বরে নয়, কাজ দিয়ে কথা বলার মানুষ।

কিন্তু মৃত্যুর পর যা ঘটল, তা ছিল হত্যার দ্বিতীয় অধ্যায়।তাঁর স্ত্রী ইয়াসমিন সেদিন বিকাল থেকে ফোন করছিলেন সংযোগ পাচ্ছিলেন না।রাত ১১টার দিকে স্থানীয় এক যুবক খবর নিয়ে আসে, গলায় হেঁচকি তুলে বলে, "আপার লোকটা নাকি গুলি খাইছে..." সে মুহূর্তে ইয়াসমিন কিছু বুঝে উঠতে পারেননি, বরং তীব্র অস্বস্তি আর আশঙ্কা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।ততক্ষণে হাসপাতাল থেকে কেউ যোগাযোগ করেনি, মিডিয়াতে কোনো ফুটেজ নেই, সরকারের মুখে এক ফোঁটা শব্দ নেই।যেন এই মৃত্যু ঘটেনি, এই মানুষ ছিল না।পরে যখন গ্রামের বাড়িতে মরদেহ পৌঁছায়, তখন ছোট ইব্রাহিমের হাতে ছিল এক ভাঙা খেলনা গাড়ি বাবার গাড়ির মতই চার চাকা, মাথা নিচু।পাঁচ বছরের ইয়াসিন চুপচাপ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, সে জানত কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি এই চিরচেনা মানুষটা আর কখনো ফিরে আসবে না।

রাষ্ট্র তখন ব্যস্ত ছিল 'নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক' দেখানোর ভান করতে।কোনো কর্মকর্তা আসেনি, কোনো শহীদ সম্মান ঘোষণা হয়নি।অথচ এই মানুষটা রাস্তায় পড়ে থাকা গুলির খাদে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল কেবল সত্যের পক্ষ নিয়ে।তার মৃত্যু রাষ্ট্র স্বীকার করেনি, তবে ইতিহাস স্বীকার করে ফেলেছে। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের কবরস্থানে যখন তাঁকে মাটির নিচে শোয়ানো হয়, তখন আকাশ ছিল কালো, বাতাস নিস্তব্ধ, চারদিক কেবল নারীর কান্না আর শিশুর ফিসফিসে।তখন কেউ উচ্চারণ করেনি, "এই মানুষটা শহীদ।' তবে তার শোকে নুয়ে থাকা মানুষের মুখে মুখে রটে যায়, "আমির ভাই গুলিতে মরেনি, তিনি ইতিহাসের মুখ রক্ষা করতে গিয়ে পড়ে গেছেন।'

এভাবেই চুপচাপ রাষ্ট্র একটা ভবিষ্যৎ মেরে ফেলে।শুধু গুলি করে নয়, ভুলে গিয়ে, অস্বীকার করে।কিন্তু একদিন কেউ না কেউ সেই গুলির ছবি এঁকে দেবে দেয়ালে, বাচ্চারা তাকে চিনবে নাম ধরে, বইয়ে নয় রক্তের গল্পে।তখন বলা হবে, এই আমির হোসেন গাড়ি চালাতেন না তিনি একটি বিপ্লব চালিয়েছিলেন, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত।

আমির হোসেন আজ গাড়ি চালান না; তিনি আজ জাতির চাকা চালিয়ে দিয়েছেন রক্ত দিয়ে।শহীদ আমির হোসেনের নাম আমরা ভুললে, আমরা শুধু একজন মানুষ নয়–একটি বিপ্লবই হারিয়ে ফেলি।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : আমির হোসেন

জন্ম : ৭ মে ১৯৯২

পেশা : প্রাইভেট কার চালক

ঠিকানা : বরগাঁও, সুবিদপুর, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

পিতা : খোরশেদ আলম (৫৫ বছর, কৃষিকাজ করেন)

মাতা : রহিমা বেগম (৫০ বছর, গৃহিণী)

স্ত্রী : ইয়াসমিন বেগম (৩০ বছর, গৃহিণী)

সন্তান : ইয়াসিন (৫ বছর), ইব্রাহিম (২.৫ বছর)

ঘটনার বিবরণ : ৫ আগস্ট ২০২৪, ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায় শহীদ হন পুলিশের গুলিতে আনুমানিক

: বিকাল ৪টার দিকে আঘাত পান

আঘাত : গলার নিচে দুটি গুলি এবং বুকে ছড়াগুলি লাগে।হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান

দাফন : নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে

বর্তমান অবস্থা : পরিবার আর্থিক অনুদানের সহযোগিতায় কোনরকম দিন অতিবাহিত করছে

প্রস্তাবনা : ১. দুই ছেলের পূর্ণ শিক্ষাব্যয় বহন ও বৃত্তি

: ২. স্ত্রীর জন্য হস্তশিল্প বা ছোট উদ্যোগ সহায়তা

: ৩. পারিবারিক জমিতে ঘর নির্মাণে সরকারি সহায়তা